Journal of Teacher Education, Vol.8, No. 1, 125-136, 2023 **ISSN 1812-7517**

প্রয়োগমূলক শিক্ষাব্যবস্থা: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও উত্তরণ

মিজানুর রহমান *

সারসংক্ষেপ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানব জীবনের ওপর যত প্রকারের প্রভাব বিস্তৃত হয় সবকিছুই শিক্ষা নামে অভিহিত হতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে আমরা বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে জানা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের জন্য জ্ঞান লাভ করাকে বুঝি। আমেরিকান প্রয়োগবাদের প্রবক্তা জন ডিউঈও শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তির উন্নয়ন সাধন নয়, ব্যক্তির সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে যা তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ শেষে যদি তার শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম না হয় তাহলে এই শিক্ষা বৃথা। অতএব শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি বাস্তব উপযোগিতার ওপর বেশি জোর দেয়া হয় তবে বেকারত্বের হার কমে যাবে নি:সন্দেহে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োগবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ও আমাদের প্রেক্ষাপটে এ শিক্ষাব্যবস্থায় উত্তরণের উপায়।

সূচক শব্দ: *প্রয়োগবাদ, শিক্ষা, দর্শন ও বাংলাদেশ।*

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ

বর্তমানে বহুল প্রচলিত শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শ্বাস'-ধাতু থেকে। এর বহুবিধ অর্থ হলো-'শাসন করা','শৃঙ্খলিত করা','নিয়ন্ত্রিত করা', ও প্রশিক্ষণ দেয়া বা নির্দেশনা দেয়া। সাধারণত বাংলা ভাষায় শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার করা হয় শিক্ষনের কৌশল শেখানো হিসেবে। আবার ইংরেজি Education শব্দটি মূল ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে এসেছে যার অর্থ হলো প্রতিপালন বা পরিচর্যা করা। দ্বিতীয় এক মতবাদ অনুযায়ী এই শব্দটি এসেছে মূল ল্যাটিন 'Educatum' থেকে। যার অর্থ হলো 'শিক্ষাদানের কাজ' (act of teaching) বা 'নির্দেশনাদান'(Instruction)। অপর তৃতীয় মতবাদ অনুযায়ী 'Educare' শব্দের অর্থ হল 'বের করে আনা' (To draw out)। এই ক্ষেত্রে শিক্ষার অর্থ হলো শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোকে পরিস্ফুটিত করার প্রক্রিয়া (রায়, ২০১৭,পৃষ্ঠা, ৪-৫)। ইংরেজি 'Education' শব্দের প্রথম দুটির বুৎপত্তিগত অর্থকে সংকীর্ণ অর্থ এবং তৃতীয় মতবাদটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। আসলে শিক্ষা বলতে মূলত ব্যাপক অর্থকেই ইঙ্গিত করা হয়। শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থের তুলনামূলকচিত্র:

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ	শিক্ষার ব্যাপক অর্থ
অর্থ: জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা।	অর্থ: শিশুর সকল রকম সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশই হলো শিক্ষা।
লক্ষ্য: পাঠ্যপুস্তক-কেন্দ্রিকজ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মানসিক বিকাশ।	লক্ষ্য: শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ইত্যাদির সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক বিকাশ।

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ	শিক্ষার ব্যাপক অর্থ
ব্যাপ্তিকাল: বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।	ব্যাপ্তিকাল: ব্যক্তির জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।
বিষয়বস্তু: কতগুলো অপরিবর্তনীয় তাত্ত্বিকজ্ঞান।	বিষয়বস্তু: তাত্ত্বিকজ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়।
শিক্ষকের ভূমিকা: তাত্ত্বিক জ্ঞান বিতরণ করা।	শিক্ষকের ভূমিকা: শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ এবং তার বন্ধু ও সহায়কের ভূমিকা।
শিখন ও শিক্ষণ কৌশল: মৌখিক নির্দেশনা ও আবৃত্তি।	শিখন ও শিক্ষণ কৌশল: শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ভিত্তিক কৌশল।
শিক্ষার্থীদের ভূমিকা: নিষ্ক্রিয় শ্রোতা বা গ্রহিতা।	শিক্ষার্থীদের ভূমিকা: সক্রিয়ভাবে চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন।

ছক-১ (উৎস: রায়, ২০১৭, পৃষ্ঠা. ৭-৮)

শিক্ষাকে বলা হয় মানবজীবনের এক অমূল্য সম্পদ। কেননা, সামগ্রিকভাবে একজন মানুষকে বিকশিত হতে হলে যেসব অপরিহার্য উপকরণ প্রয়োজন, এর মধ্যে শিক্ষার স্থান সর্বাগ্রে। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভাকে উন্মোচিত করে আনার এক অনিবার্য উপায়। প্রকৃত শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে অসে। দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ‘সত্যের আবিষ্কার ও মিথ্যার অপনোদন’। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে তিনি দেহ ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। বিশ শতকের দিকে শিক্ষার আর এক ধরণের সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। আচরণবাদী বিজ্ঞান থেকে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। জর্জ কাউন্ট ও জর্জ চাইল্ড হলেন এ সংজ্ঞার প্রবক্তা। তাঁদের মতে, শিশুরা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বাস করে সেই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব, মূল্যবোধ ও উপলব্ধি অনুসারে শিশুকে তৈরি ও গঠন করাই হলো শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে শিক্ষার একাজ চিরস্থায়ী নয়। এইমতবাদ অনুসারে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও পরিবর্তিত হবে। (খাতুন, ২০১৩, পৃষ্ঠা, ১৩১-১৩২)। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি রয়েছে সেগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের এক অব্যাহত অনুশীলন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটার ওপর অধিক গুরূত্বারোপ করা, বিশেষত: প্রয়োগমূলক শিক্ষার বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তার যথার্থতা ও কার্যকারিতা নিরূপণ করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষার্থীদের ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখতে হবে। নৈতিক শিক্ষার গুণটি তাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে এবং সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।
- দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে দক্ষ মানবসম্পদের কোনো বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ। তাই লাগামহীন উচ্চ শিক্ষার

পরিবর্তে উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলেই কেবল বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

- শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা। শুধুমাত্র সনদভিত্তিক জ্ঞান অর্জন নয়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে সে সমাজের বোঝা না হয়ে রাষ্ট্রের সম্পদে পরিনত হয়।
- ভোগবাদী বিশ্বে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটছে প্রতিনিয়ত। কাজেই শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা।
- শিক্ষা যেকোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সচেতন করে গড়ে তুলা জরুরী যাতে সে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ সহজে মোকাবেলা করতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি

যেকোনো গবেষণা কর্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তথ্য সংগ্রহ করা। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্লেষণী পদ্ধতি (Analytical method) ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধটিতে গুণগত (Qualitive) ও পরিমাণগত (Quantitive) উভয় ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অতীত ও সমসাময়িক গবেষণা প্রতিবেদন অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক কাঠামো প্রনয়ণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিকে আরও তথ্যবহুল করার লক্ষ্যে ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতার বিভিন্ন দিক এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চলমান বিভিন্ন ঘটনাবলীও গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যার ফলে প্রবন্ধটির লব্ধ ফলাফল প্রায়োগিক হয়েছে।

গবেষণা প্রবন্ধটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথ্য সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ বিজ্ঞজনের মন্তব্য, প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট সেমিনারে অংশগ্রহণ, প্রতিবেদন, জার্নাল, সাময়িকী, ক্রোড়পত্র প্রভৃতি উৎসসমূহ তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। যদিও প্রবন্ধটি রচনায় মাঠ পর্যায়ের কোন জরিপমূলক গবেষণা করা হয়নি তবে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও দর্শন বিভাগীয় সেমিনার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রয়োগমূলক শিক্ষা দর্শন

দর্শন সর্বক্ষেত্রে জীবনের সাথে যুক্ত। পাশ্চাত্য দর্শনগুলোর মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদ বা প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রয়োগবাদী দর্শন প্রধানত ভাববাদের বিপরীত ধারা। এ মতবাদ দার্শনিক আলোচনায় ব্যবহারিক, নৈমিত্তিক, উপযোগিতা, ফলপ্রসূ, সন্তুষ্টিবিধান প্রভৃতি দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এর মূলকথা হলো উপযোগিতা বা জীবনের দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা। প্রয়োগবাদী দর্শন বাস্তবমুখী। জন ডিউঈ, কিলপ্যাট্রিক, উইলিয়াম জেমস এ মতবাদের সমর্থক। ডিউঈ বলেন,

> Our net conclusion is that life is development, and that developing, growing, is life. Translated into its equivalents, this means…. The educational process is one of continued re-organizing, reconstructing, and transforming (Dewey, 1916, p.59).

প্রয়োগবাদী দর্শনে মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার একটা ব্যবহারিক দিক আছে। সুতরাং লক্ষ্য করা যায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত। প্রয়োগবাদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুকে সেই সব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক কর্মে নিয়োগ করা যার মাধ্যমে তার জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষার পাঠক্রম হবে একটি সুসামঞ্জস্য অভিজ্ঞতার একক (Integrated unit of experience), যেখানে জ্ঞানের বিষয়গুলো হবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরিবর্তনশীল। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হবে। শিক্ষার পদ্ধতি হবে প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে বা কর্মকেন্দ্রিক। আধুনিককালের প্রজেক্ট পদ্ধতি এই প্রয়োগবাদের অবদান। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ জীবন গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকরা, যাতে সে জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারে। সংক্ষেপে প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শনের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ছক আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে:

শিক্ষার লক্ষ্য:	ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সৃষ্টি।
পাঠক্রম:	সমন্বিত উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞান।
শিক্ষণ পদ্ধতি:	ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলগত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা।
শিক্ষক:	পর্যবেক্ষক ও সহায়ক।
শিক্ষালয়:	সমাজের প্রতিচ্ছবি।
শৃঙ্খলা:	আগ্রহভিত্তিক শৃঙ্খলা।

ছক-২ (রায়, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১২৩)

প্রত্যেক রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি থাকে। রাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ, শিক্ষা দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রণীত এসব পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। শিক্ষার সাথে রাষ্ট্রের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তা Plato, Aristotle, Dewey প্রমুখ শিক্ষা দার্শনিকগণ তাঁদের চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। Plato ও Aristotle এর শিক্ষাদর্শন বিবৃত হয়েছে যথাক্রমে *The Republic* এবং *The Politics* গ্রন্থে। এসব গ্রন্থে দার্শনিকদ্বয় রাষ্ট্রচিন্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Plato-র শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই ছিল তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত শাসক শ্রেণি তৈরী করা। এ ধরণের অভিভাবক শ্রেণি তৈরী করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করেছেন তাঁর- *The Republic* গ্রন্থটিতে। মূলত একটি স্থিতিশীল সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। Smith বলেন, education does not lend itself to definition, and certainly not to one that can endure as unalterably true (Smith, 1966, p.7). আধুনিককালে পৃথিবীর প্রায় সব শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে-

প্রয়োগবাদী শিক্ষা দার্শনিক John Dewey-র শিক্ষাদর্শন। এটি একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবর্তিত, অন্যদিকে তেমনি যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ ও নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা ব্যক্তির ক্রমবিকাশের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তির ক্রমবিকাশ বলতে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীসমূহকে তার নিজস্ব পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। এই পরিণতি নির্ধারণ করে দেয় দুটি বিষয়- একটি ব্যক্তির নিজের অভ্যন্তরীন সংগঠন এবং অপরটি যে সমাজে ব্যক্তি বসবাস করে সেই সমাজের বিভিন্ন শক্তি । তাই শিক্ষা কেবল একটি প্রক্রিয়া নয় বরং এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ একা একা ঘটে না বরং সমাজের সকল সদস্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে কতগুলি মৌলিক স্বভাব শিশুদের মধ্যেও বিকশিত হয়। ডিউঈ বলেন,

> If we are willing to conceive education as the process of forming fundamental dispositions, intellectual and emotional toward nature and fellow men, philosophy may even be defined as the general theory of Education (Dewey, 1916, p. 383).

শিক্ষার এই সংজ্ঞায় ডিউঈ কতগুলো মৌলিক স্বভাব গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন। এই মৌলিক স্বভাবগুলো হল প্রধানত বৌদ্ধিক, আবেগিক ও সামাজিক। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন, বৃহত্তর সামাজিক পরিসর, এমনকি শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থীদের স্কুল জীবনে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এই সহযোগিতামূলক মৌলিক স্বভাব ডিউঈ এর প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শনেও পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আন্দোলনের ফলে আমেরিকায় ও পরবর্তিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেটি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের ন্যায় শিশুর সামাজিকীকরণ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুরূপ প্রাধান্য বিস্তার করা।

ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সমাজে বসবাসের উপযোগি করে গড়ে তোলার জন্য সমাজের পক্ষ থেকেই শিক্ষার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সমাজ জীবনের উপযোগি শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট পরিবেশসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হল বিদ্যালয়। আবার সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন শিক্ষা বিকাশ লাভ করে তখন শিক্ষার প্রকৃতি ও সার্থকতা নির্ভর করে সামাজিক সংগঠনের স্বরূপের ওপর। ডিউঈর মতে, এদিক দিয়ে আদর্শ সামাজিক সংগঠন হল গণতন্ত্র। তাঁর মতে, যে সকল বিষয়ের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই তথা যে সকল বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারে না, সে শিক্ষা গ্রহণ করা নিরর্থক। এজন্য তিনি বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেন । বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, open-mindedness should be one of the qualities that education aims at producing (Russell, 1932, p.43) । তিনি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচনে দুটি প্রধান ধারা উল্লেখ করেছেন- ১. আদর্শ বা ভাল চরিত্র গঠন ২. বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ স্থাপন। তিনি মূলত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে সম্পর্কিত করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে উপযোগি করে গড়ে তোলে। তিনি বলেন,

> I [Russell] will take four characteristics which seem to me jointly to form the basis of an ideal character: vitality, courage, sensitiveness, and intelligence. I do not suggest that this list is complete, but I think Sit carries us a good way. Moreover, I firmly believe that, by proper physical, emotional, and intellectual care of the young, these qualities could all be made very common (Russell, 1926, p.35).

আধুনিক চিন্তাধারায় শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কোনো সমাজে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার পরিকল্পনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এই অর্থে সমাজ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমান সমাজেও এই সম্পর্ক চলমান রয়েছে। শিক্ষা ব্যতিত সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। ডিউঈ বলেন, Since a democratic society repudiates the principle of external authority, it must find a substitute in voluntary disposition and interest; these can be created only by education (Dewey, 1916, p.101).

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে-

> "দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা, শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নের্তৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করা।"
>
> (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, অধ্যায়-১, পৃষ্ঠা-১)

বাংলাদেশে বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। গণতন্ত্রের আধুনিক ধারণা মূলত সমাজ দর্শনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল দিকই এর অন্তর্ভূক্ত। মূলত ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সাম্য, সহনশীলতা, সহযোগিতামূলক মনোভাব, বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবর্তন, শৃংখলা, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা এসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, গণতন্ত্রের উপযোগি মানসিক গুণের বিকাশ, বৃত্তিমুখী শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। এ শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম এমনভাবে প্রণীত হয় যাতে সমাজ জীবনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এখানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাও অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল- যে কোনো ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী এবং পছন্দমত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা। সমাজতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো কোন আদর্শ বা নীতি এখানে চাপিয়ে দেয়া হয় না। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং জনগণ সকলের মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

অযথা তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে ভারাক্রান্ত করার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। জন ডিউঈ-এর মতে শিক্ষা হবে বাস্তবভিত্তিক। তাঁর মতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল-সহজাত ব্যক্তিত্বের

বিকাশ, সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জন এবং ব্যক্তিগতভাবে মানসিক উৎকর্ষতা লাভ। শিক্ষার প্রধান কাজ হল মানবসম্পদ উন্নয়ন। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। মানবসম্পদ উন্নয়নের কৌশলসমূহ মূলত শিক্ষা নির্ভর। আমাদের এই বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তি তথা মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রয়োজন স্বাস্থ্য, দক্ষতা, সাক্ষরতা ও কর্মসংস্থান। দেশের কোন নাগরিক তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত বিভিন্ন অভ্যাস গঠন করে সেগুলোর দ্বারা নিজের আচরণকে পরিচালিত করা । অসুস্থ ব্যক্তি কখনও সমাজের সম্পদ হতে পারে না। বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্তের হার বেশী হওয়াতে জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি হয় না। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, জনসম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপাদান হলো স্বাস্থ্য।

দ্বিতীয়ত, মানব সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। কোন ব্যক্তিকে তখনই সামাজিক দিক থেকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যখন সে সামাজিক কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তিকে একটি মাছ খাওয়ার জন্য দিলে সেটি হবে তার কল্যাণ আর লোকটিকে কিভাবে মাছ ধরতে হয় তা যদি শিখানো হয় তখন সেটি হবে তার উন্নয়ন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সাথে কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে । এই ক্ষমতা তাকে বিশেষ কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন। ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যক্তির জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতার চর্চা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কর্মদক্ষতা বিকাশের এই চারটি দিকই প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, মানবসম্পদের যে উপাদানের ওপর বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় তা হলো সাক্ষরতা। মানুষের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে জীবনকে যথার্থভাবে উপলব্দি করতে সহায়তা করে সাক্ষরতা। ব্যক্তি তার জীবনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই তার মধ্যে উন্নয়নমুখী পরিবর্তন আসবে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রের মানবসম্পদ যদি ব্যবহার না হয় তবে তার কোন মূল্য নেই। যেমন কোনও রাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ থাকলেই সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐ খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে তবেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। একইভাবে রাষ্ট্রের মানবসম্পদকে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারলেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপট

বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা ও সংকট বিরাজ করছে। আমাদের রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব, মানসম্পন্ন গবেষণাগারের অভাব, মানসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা, গ্রন্থাগারের অপর্যাপ্ততা এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব। শিক্ষার্থীরা নোট বই এবং কোচিং নির্ভর হয়ে পড়ছে। তাছাড়া বর্তমানে আমাদের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বরং পরীক্ষায় কিভাবে অধিক নম্বর পাওয়া যায় তার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে যা শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের চলমান সংকটকে আরো ঘনীভূত করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়েনি। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করার মানসিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এবং গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শেষ করেও কাজ করার পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছে না। গতানুগতিক শিক্ষার ফল এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যেসকল পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করার কথা ছিলো, তারা হচ্ছে ব্যাংক কর্মকর্তা। একজন শিক্ষা গবেষণার শিক্ষার্থী যার উচিত ছিলো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা সে হয়ে যাচ্ছে পুলিশ অফিসার। রসায়নের ছাত্র হচ্ছেন ফরেন ক্যাডার। যার ফলে এসব জায়গায় এমন জনবল নিযুক্ত হচ্ছে যাদের সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলি সম্পর্কে প্রকৃত অর্থে তেমন কোনো ধারণাই নেই।

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধ্যান ধারণা সমাজ ও বৈশ্বিক উপযোগিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসম্পদে পরিণত হতে পারছে না। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানসিক হীনমন্যতা কাজ করে থাকে। আমাদের অধিকাংশ অভিভাবক বিদ্যালয়ে সন্তান কি শিখছে তার চেয়ে বরং সন্তানের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের চেয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ অর্জনই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজসমূহের ভর্তিকৃত স্নাতক পাশ ও সম্মান পর্যায়ে ২০১৬ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,২৭,৯০০ জন (ছয় লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত জন)। (তথ্যসূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬, পৃষ্ঠা-১১৫)। এভাবে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষায় তথা গতানুগতিক শিক্ষায় ভর্তি হচ্ছে যাদের অর্জিত সনদ বেকারত্ব দূর করার পরিবর্তে বেকারত্বের বোঝাকে ক্রমশ আরও ভারী করছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সমস্যার শেষ নেই। অধিকন্তু নতুন নতুন সমস্যায় এটি প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছে। ফলে আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মেধাবী, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক ও   সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী মানবসম্পদ গড়ে তোলা তাই এখন সময়ের দাবি । বাস্তব উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োগমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই এই দাবি পূরণ করা সম্ভব।

উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগমূলক শিক্ষার গুরুত্বারোপ করার মাধ্যমে চলমান সমস্যা অনেকটাই লাঘব করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা জরুরি।

প্রথমত, উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা বৃদ্ধি করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বিনিয়োগের সংকল্প করেছিলেন অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও আজ বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এখনো ২ থেকে ২.৫০ শতাংশের ওপরে যেতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয় হলো নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও আহরণের উৎকৃষ্ট জায়গা। কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা যথেষ্ট অপ্রতুল। গবেষণা বাবদ অতি অল্প পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি হয়নি। আমাদের কিছু সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে যারা মৌলিক গবেষণায় আগ্রহী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার সুযোগ না পেয়ে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। যতদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ

তৈরী না হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা পিছিয়ে থাকব। তাছাড়া গবেষণার জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি অনুদানের খাতগুলো আরও সহজ করে গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন।

বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক গবেষণার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার নতুন নতুন কলাকৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে । আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান এবং ক্রমশ আরও নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সংযোজিত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব আরো বেশী। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে উপযুক্ত গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা ও সুপারিশ পাওয়া সম্ভব। উন্নত দেশগুলো গবেষণার মাধ্যমেই তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছে। অথচ আমাদের দেশের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উল্টো। শিক্ষিত জনশক্তি অনেক ক্ষেত্রেই এখন দেশের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে-

> “সর্বক্ষেত্রে মান সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।”
>
> (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, অধ্যায়-১, পৃষ্ঠা-২)

কাজেই দেশের ভৌত অবকাঠামো, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যুগোপযোগী গবেষণা পরিচালনা করে গবেষণালব্ধ ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। UNSECO গুণগত শিক্ষার একটি বর্ণনামূলক ধারণা প্রদান করেছে। জাতিসংঘের এই সংস্থাটির মতে-

> Quality has become a dynamic concept that has constantly to adapt to a world societies are undergoing profound social and economic transformation. Encouragement for future-oriented thinking and anticipation is going importance. Old nations of quality are no longer enough………. despite the different contexts there are many common elements in the pursuit of a quality education, which should equip all people, women and men, to be fully participating members of their communities and also citizens of the world.”
>
> (Ministerial Round Table on Quality Education, UNSECO, 2013,P-1)

এখানে শিক্ষার গতানুগতিক ধারণা পরিহার করে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, সাম্য এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ধারণা গঠনের চেষ্টা চালানো হয়েছে। গুণগত শিক্ষা প্রয়োগমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, জীবনদক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধকে বিকশিত করে। বিশ্বায়নের এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য এক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন সংসদে পাশ করেছে। শিক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছেন শিক্ষক।

শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে অনেক উচ্চশিক্ষিত মেধাবীদের আগমন ঘটছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে প্রশিক্ষণে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগাতে হবে। গুণগত শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো উপাদানের সমন্বিত এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলো অপরিহার্য-

- পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক
- যথার্থ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি
- যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম
- কার্যকর ব্যবস্থাপনা
- উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো
- গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী
- দুর্নীতি নির্মূল ও অপচয়রোধ

তৃতীয়ত, প্রয়োগবাদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বাইরে, ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায় যে কোনো কাজে বা পেশায় অতি দক্ষতার সাথে কাজ করার যোগ্যতা লাভ করে। কর্মমুখী শিক্ষা মূলত পেশাগত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। এটি এক ধরণের বিশেষায়িত শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলে। এই কর্মমুখী শিক্ষার শক্তিই হচ্ছে জাতি গঠনে এবং উন্নয়নের আসল শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান আহরণের পথকে সুগম করলেও জ্ঞানের পূর্ণতা আসে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। আমাদের দেশে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি, প্রকৌশলী, বৃত্তিমূলক প্রভৃতি কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাও আছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো অপরিহার্য। বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের তরুণ সমাজকে সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষত কৃষি ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন কলাকৌশল হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

চতুর্থত, শ্রমবাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতি বছরই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় থাকা অতীব জরুরি। খাপছাড়া উচ্চশিক্ষা চাকুরীর বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলশ্রুতিতে পড়ালেখা শেষ করেও এই বিশাল যুব সমাজ ক্রমশ বেকারত্বের জালে পতিত হচ্ছে। অথচ অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী চাকুরীর বিজ্ঞাপণ দিয়েও কাজের জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে পাচ্ছেন না। কাজেই আমাদের পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, জাহাজ শিল্প, সফটওয়্যার, আইটিখাত, চামড়াজাত শিল্পসহ বিভিন্ন চাকুরীর বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করে চলমান সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বর্ণিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার কৌশল বাস্তবায়নই হবে প্রয়োগমূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন করা। শিক্ষাদর্শন, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুগোপযোগী এবং বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়-
"জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০"। এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

"শিক্ষানীতি .... দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।"
(জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, অধ্যায়-১)

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে-

> "অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এ ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।"
>
> "অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিল্প কারখানা এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া ১, ২ ও ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২,৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।"
>
> (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, অধ্যায়-৫, পৃষ্ঠা-১৫,১৬)

এছাড়া বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়নে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্পন্ন পুস্তক প্রণয়ন, প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা স্বরূপ উপবৃত্তি প্রদান, চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের কারিকুলাম পরিবর্তন, পরিমার্জনসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষানীতিতে বর্ণিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব।

সর্বোপরি নৈতিকতা এবং চরিত্র গঠনের বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য তাত্ত্বিক নয়, ব্যবহারিক। নৈতিকতা বিষয়টিও ব্যবহারিক যা সরাসরি আচরণের সাথে জড়িত। বর্তমানে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাফল্য মূল্যায়নের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে পরীক্ষা। তাই শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা, চরিত্রগঠন এসব বাদ দিয়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাকেই একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করছে। এ সম্পর্কে কবি আবুল মোমেনের নিম্নোক্ত অভিব্যক্তি প্রণিধানযোগ্য-

> "নীতিশিক্ষা ও চরিত্রগঠন নিয়ে বাঙালি বড়ই ভাবিত। পরিষ্কার বলা দরকার, পড়াশোনা চরিত্র গঠনে তখনই সহায়ক হবে, যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ব্যক্তি (শিক্ষক) এবং কার্যক্রম (পাঠ ও সহপাঠ) এই চাহিদার সঙ্গে মানানসই দৃষ্টান্ত ও অনুকূল পরিবেশ রচনা করবে। .... আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর একমাত্র করণীয়, তাদের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সমাজ (এবং গণমাধ্যম) স্বীকৃত সাফল্যেও একমাত্র ক্ষেত্র পরীক্ষা, তাদের ছাত্রজীবন ঘন ঘন পরীক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা প্রস্তুতিতেই কেটে যায়। এতে তারা সর্বক্ষণ প্রতিযোগীতায় ও সাফল্যের চাপে জর্জরিত থাকে। এমন চ্যালেঞ্জের চাপে যে কচি জীবনটা কাটে, তাতে মানবিক গুণ ও সুকুমারবৃত্তির মতো যেসব গুণাবলি জীবনযাপন, অনুশীলন ও উপভোগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অর্জনযোগ্য সেগুলো সম্পূর্ণই উপেক্ষিত থেকে যায়।"(মোমেন, 'শিক্ষার উল্টোযাত্রা', দৈনিক প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)

উপসংহার

একটি জাতির নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সেই জাতির সামাজিক,সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতি ও অবস্থানকে তুলে ধরে। যে জাতি যতো বেশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে জাতি ততো বেশি সুসংহত। কাজেই শিক্ষার্থীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষাকে শিক্ষার সকল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। মাঝে-মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোন ভালো কাজের অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিকে বলা হয় 'Activity Based Learning'। প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুদের নৈতিক শিক্ষাদান করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লকের মতে, শিশুদের মন-মস্তিষ্ক থাকে পানির মত। পানিকে যেমন যেদিকে ইচ্ছা নেওয়া যায়, তেমনি কোমলমতি শিশুদের মনকেও ইচ্ছামতো করে গড়ে তোলা যায়। নৈতিকতার প্রায়োগিক দিকটাকে এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োগমূলক শিক্ষার বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে বেকার সমস্যা হবে দূরীভূত, দেশ হবে সমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ হবে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিনত হওয়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা। অতএব একাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি চরিত্রগঠন, নৈতিকতা, সুন্দর জীবন গঠনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করে তুলতে পারলেই প্রয়োগমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

খাতুন, শরীফা, *দর্শন ও শিক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯ ।

রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, সোমা বুক হাউস, কলকাতা, ২০১৭।

মোমেন, আবুল 'শিক্ষার উল্টোযাত্রা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, অধ্যায়-১, অধ্যায়-৫।

পাটোয়ারী, মমতাজ উদ্দীন (২০০৭), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান (২০০০), *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০১৪), *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

রহমান, মোস্তাফিজুর (১৯৭৪), *শিক্ষা-দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হক, শামসুল (১৯৮৫), *উচ্চ শিক্ষা-বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dewey, John, *Democracy and Education*, the Macmillian Publishers, NewYork, 1916.

Russell, Bertrand, *On Education* (London, George Allen & Unwin Ltd., 1926.)

Ministerial Round Table on Quality Education, UNSECO, 2013.

Smith, W. O.L, *Education*, Harmonds worth, England: Penguine Books Ltd. 2nd ed., 1966.